মিঠু

মমতা চৌধুরী

শুভাকাঙ্খী বন্ধু সজ্জনেরা আজকাল দেখা হলেই বলে ‘অনেক দিন তোমার লেখা দেখিনা, কি হলো?’ স্মিত হেসে অস্পষ্ট স্বরে নানা অজুহাত দাঁড় করাতে চেষ্টা করি, যত না অন্যের কাছে তার চেয়ে অনেক বেশীই যেন নিজের কাছেই। কারণ আমি নিজেই জানিনা কেন আর আমি লিখতে পারিনা। নিজেকে সান্ত্বনা দিই কাজের চাপ, সময়ের স্বল্পতার কথা বলে। আমার লেখারা ফিরে ফিরে যায়, ঝুড়ে ঝুড়ে যায়, না ফোটা কলির মত। তবুও আমি লিখিনা, লিখতে পারিনা। কোন কোন দিন সংকল্প দৃঢ় হয়, আমার শব্দ গুলোকে সাজাতে চাই কথার মালায়, অভিজ্ঞতার আলোকে, মনের মাধুরী মিশিয়ে। শুরু করি কিছু লিখতে - মাঝ পথেই তারা যেন কোন শীর্ন নদীর মত মুখ লুকায় মনের খরার বালুর স্তুপে। আমারই অবহেলা। আর আমি ফিরে যেতে পারিনা তাদের কাছে। আমি লিখতে বসলেই মিঠু আসে। স্মরণের ওপার হতে আমি শুনি সেই শিশু কন্ঠ ‘ভাইয়া, আস খেলতে যাই’। আমি সব কিছু ফেলে আলোর গতিতে ছুটে ফিরি তিন দশকের ও আগের অলস দুপুরে কিংবা বৃষ্টি ঝড়া সন্ধ্যায়। আমাকে একা রেখে মিঠু কখন যে হারিয়ে যায় যেমনি করে নুরুল ইসলাম স্যারের কাছে পড়তে বসে ‘পানি খেয়ে আসছি’ বলে আর ফিরে আসত না। আমার রাগ হত - আমি মাষ্টার মশায়ের সামনে একলা বসে উসখুশ করতাম। একসময় স্যার বলতেন, ‘যাও মেয়ে, অনেক হয়েছে, আজ আর তোমার পড়তে হবেনা’। আমার ছুটি হত। আমি আমার সব উষ্মা নিয়ে ভিতর বাড়িতে যেয়ে দেখতাম মিঠু ভেতরে এসে কাউকে কিছু না বলে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি যে কিছুই আর বলতে পারতাম না ওকে, ও যে ‘ঘুমিয়ে’ গেছে তখন। পরদিন নুরুল ইসলাম স্যার এসেই প্রথমে স্কেল দিয়ে দু’ঘা দিত মিঠুকে গতরাতে না ফিরে আসার জন্য, আমাকে স্যার সেদিন আগে আগেই ছেড়ে দিতেন ওকে শাস্তি দেওয়ার জন্য। আরবি পড়ানোর মৌলবি স্যারের কাছেও ও একই শাস্তি পেত পড়ার মাঝে বার বার উঠে যাওয়ার জন্য কিংবা অন্য কোন কারণে। আমার কিন্তু ওর উপর তখন আর কোন ক্ষোভ থাকত না, বরঞ্চ মায়াই হত ওর জন্য, যদিও জানতাম স্যার কিংবা মৌলভি সাহেব চলে যাওয়ার পর অকারনে আমার জুটবে বিনুনিতে হ্যাচকা টান বা রাম চিমটি কিংবা কিল। তবুও ওর জন্যই যেন ছিল আমার সব অপ্রকাশিত মায়া।

আমায় ফিরতে হয় জীবনের পথে পথে। লোকে বলে ‘কি মজার চাকুরি তোমাদের, নয়টা পাঁচটা ছুটতে হয়না!’ মনে মনে বলি তাইতো! আমাদের চাকুরি তো নয়টা থেকে নয়টা। কখনো কালো হীরা কেটে আরগাইল তৈরি করা, আবার কখনো বা ‘গাঁধা পিটিয়ে গরু তৈরি’র অসাধ্য সাধন। এতে আনন্দ আছে একজন শিল্পী বা কারিগরের মত, আবার আছে অনেক হতাশা, ক্লান্তি। কখনো বা ডেড্‌লাইন মিট করার তাড়ায় রাত ভোর হয় - কখনো বা ছুটে চলি প্রশান্ত থেকে মেডিটেরিনিয়ানের পাড়ে, তাস্‌মানের এপাড় থেকে ওপাড়ে। মাউন্ট ওলিম্পাসের চূড়ায় বসে যখন মনে হয়েছিল হাত বাড়লেই বুঝি ছুঁয়ে

দিতে পারি স্বর্গের ঝড়োকা, পড়ন্ত দুপুরের সাদা ধুসর মেঘের নরম পর্দার আড়াল থেকে মিঠু আমায় চম্‌কে দিয়ে ডেকে যায়, 'পিকাবু'! আমি ভুলে যাই গ্রীক সভ্যতার সোনালী ইতিহাস আর দেব-দেবীদের রঙ্গিন কল্পকথা। আমি আলোর গতিতে ছুটে চলি আবার পিছন পানে। আমি ভেসে ফিরি এক দেশ থেকে আর এক দেশে। জল ভরা ভারী মেঘেরা যখন আমার মার অশ্রুর ধারা হয়ে ঝড়ে পড়ে তাস্‌মানের ওপাড়ে University of Massey তে আমার স্বল্পকালীন আস্তানার কাচের শার্সিতে, আমার মন আবার পাখা মেলে মেঘেদের সাথে শ্যামল কোমল মায়ের কোলে রাতের আধাঁরে আধাঁরে।

মা বলেছিল সেদিন রাতে আমাদের ঘরে একটা লক্ষ্মীপেঁচা এসেছিল আর ভোর রাতে আশ্চর্য সুন্দর বড় বড় দু'টি চোখ আর ঘন কালো ঈষৎ কোকড়ান এক মাথা চুল নিয়ে এসেছিল মিঠু। আমার বয়স তখন তিন বছরের কম। আমার কিছুই মনে না থাকার কথা, অথচ আমার মানসপটে এ যেন উজ্জ্বল রঙ্গে আকাঁ এক ছবি, হয়তবা মায়ের মুখে শুনে শুনেই। শুকনা পাতলা ফ্যাকাসে রঙ্গের 'প্রায় কথা না বলা' শান্ত মেয়েটির পর সুন্দর স্বাস্থ্যের প্রাণ উচ্ছ্বাসে ভরা মিঠু যেন এক দেবশিশু সবার কাছে। ও আজীবনই ছিল ভোরের পাখি। ওর বিচিত্র কোলাহলে ঘুম ভাঙ্গত আমাদের সবার। সবে কথা বলতে শিখেছে তখন, এক সকালে ওর কলরবে সবাই অস্থির। এক সারি বড় কালো পিপড়ে ধীরে সুস্থে চলছে ওর দুধ ভরা বোতলের কাছে আর তাই দেখে মিঠুর সে কি গর্জন 'দাদা, ডাঠি (লাঠি) আন কাম (পিপড়ে কামড় দেয় বলে ওই সদ্য কথা বলা শিশুর আভিধানে তারা 'কাম' বলেই চিহ্নিত তখন) মারি'। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর দুরন্তপনা যেন বেড়েই যায়।

গ্রীষ্মের এক অলস দুপুরে বাড়ীর সবাই যখন একটু বিশ্রাম নিত, মিঠুর কিন্তু কিছুতেই ঘুমাত না। প্রায়ই ও আমার দৃষ্টি আকর্ষন করতে নানা ফন্দি আটতো। তখন ওর বয়স তিন কি চার, আমাকে ওর খেলার অংশিদার করতে নিয়ে এলো আব্বার অনেক যত্নের লেবুগাছের সবকটি ফুল ওর দুই পকেট আর মুঠি ভরে। বিনিময়ে পেল আব্বার এক বিরাট ধমক। আরো হয়ত দু/এক বছর পর, বার বার আমায় ডাকছিল ও 'ভাইয়া, আস না খেলি আমরা - - -' আমি বাবার পাশে সদ্য পড়তে শেখা রূপকথার বইয়ের পাতায় মগ্ন । এর পর আমার মনে পরে বাবার কোলে আমি এস কে হস্‌পিটালের বারান্দায় - আমার মুখের উপরের সাদা বেন্ডেজ রক্ত রঙ্গে রাঙ্গা। বার বার আমাকে ডেকে সারা না পেয়ে মিঠু দরজা বন্ধ করার পাশ দিয়ে আমায় আঘাত করেছিল নাকের উপর। বেচারা মিঠু এর পর কত যে তিরষ্কার শুনেছে বাবার কাছ থেকে 'বোকা' বলে তার সীমা নেই - অথচ আমার কষ্ট হতো যখনি বাবা মা ওকে শাসন করতেন ওর দৈরত্বের জন্য। আম্মা পরবর্তিতে রাগ করেই বলতেন 'যদি এতই দরদ, তাহলে এত নালিশ করা কেন!' এমনি আরো কত শত ঘটনা, আজ তারা এত বছর পর কেন যে এত স্পষ্ট হয়ে ফিরে ফিরে আসে!

সেবার ঈদে আব্বা আনলেন আমার জন্য টিয়া রঙ্গের কেরোলিনের জামা আর লাল ফিতে। শুধু বায়না নয়, ঈদের আগের রাতে মিঠু দিব্যি আমার টিয়ারঙ্গের জামা আর ওর ন্যাড়া মাথায় লাল ফিতে বেধে আমার কান্নাভরা চোখের সামনে বীরদর্পে লুটোপুটি খেললো। কার সাধ্য ওকে প্রতিহত করে! ও ঘুমিয়ে যাওয়ার পর ঈদের জামার স্বত্বাধিকার আমি ফিরে পেলাম তবে তার দুমড়ানো মোচড়ান অবস্হা আমার চোখের জলকে না থামিয়ে আরো বাড়িয়ে দিল। আব্বা আমার চোখের জলের কাছে হেরে যেয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেন আর একটা নূতন জামার। মিঠু কিন্তু সকালে উঠে আর এক নূতন দৈরত্ব্যে ব্যস্ত। কখন সে হারিয়েছে আমার জামার প্রতি প্রবল আকর্ষন।

এমনি করেই কবে যে মিঠু বড় হয়ে উঠল। একদিন আমার ইউনিফর্মের কোনা ধরে শুরু করল ওর স্কুল জীবন। পড়ালেখার চেয়ে খেলাধূলায় ই ওর পারদর্শিতা বেশি যেন। সারা দিনের দাপাদাপির পর সন্ধ্যা সাতটা না বাজতেই ওর সুন্দর বড় দু'টি চোখে ঘুম পাড়ানি মাসি পিসিরা বিনা আমন্ত্রনেই আসন গাড়ত। একবার এক বৃষ্টির দিনে কোথা থেকে এলেন এক জ্যোতিষি আমাদের বাসায়। আমি বারান্দায় পানি ঝড়তে দেওয়া ছাতার নিচে পুতুলের ঘর বানিয়ে খেলছিলাম একা একা। আমাকে উনি এক নজর দেখলেন মনে হলো, জানিনা কি বললেন বাবা মাকে - তবে মিঠুকে উনি ডেকে নিলেন কাছে অনেকটা জোর করেই। জানিনা কি বলেছিলেন উনি মিঠু সম্পর্কে সেদিন। কিছুক্ষন পর উনাকে চলে যেতে দেখলাম। এর কিছুদিন পর মিঠু প্যারা টায়ফয়েডে পরলো - ওর নন্দ গোপাল চেহেরা ম্লান হয়ে এলো। মা দেশময় খুঁজতে পাঠালেন সেই জ্যোতিষিকে - পেলেন না কোথাও। টায়ফয়েড থেকে উঠে মিঠু যেন কেমন শান্ত হয়ে এলো। ও হঠাৎ নিয়মিত নামাজ পড়া শুরু করল। বাড়ির সবার কাছে আট বছরের বালকের তাহাজ্জতের নামাজ পরার ব্যাপারটা কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হলো।

১৯৭৪ সন। দুর্ভিক্ষ, মহামারি, রক্ষীবাহিনীর অত্যাচারে বাতাস ভারি, এর মাঝে ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের ক্লাস ফোরের ছাত্র মিঠু মুক্তিপনের শর্তে 'হাইজ্যাক'। আজও মনে পড়ে মিঠুর স্কুল থেকে ফেরার সময় পার হয়ে যাচ্ছে বলে আম্মা পাশের বাড়ির খোকনের কাছে দারওয়ানকে পাঠালেন ওরা স্কুল থেকে ফিরেছে কি না জানতে। খোকন আমার বড় ভাইয়ের বন্ধু - যার সঙ্গে মিঠু স্কুল থেকে ফিরত। খোকন ম্যাট্রিক পরীক্ষার 'টেষ্টে'র প্রস্তুতির জন্য সেদিন স্কুলে যায়নি। এর পরেই এলো সেই ফোন - আমার মাকে বলা হল মিঠুকে হাইজ্যাক করা হয়েছে স্কুল থেকে বড়ভাই একসিডেন্ট করেছে বলে। মুক্তিপনের বিনিময়ে ওকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তবে আইনের আশ্রয় চাইলে ওই শিশুর জন্য মাত্র একটা বুলেট খরচ করা হবে বলেও আমার মাকে শাসানো হলো। মা আমার পাগলিনী প্রায়, বাবাকে তার অফিসে জানানো হলো। মুক্তিপনের টাকা দিয়ে পাঠান হল আমার বড় ভাইকে যেখানে ওকে যেতে বলা হয়েছিল। কিন্তু সারারাত কেউ এলোনা। ওই একটা রাত আমার বাবা মার বুক ফাটা ক্রন্দনে আর অসহনীয় কষ্টে ভোর হল। পরদিন সকালে যখন অন্তত মিঠুর নিথর দেহের সন্ধানে আত্মিয় স্বজনেরা শহরের পথে পথে ঘুরছিলেন, তখন এক তরুন এলো দেবদূতের মত। আমার বাবাকে তার কাছে মুক্তিপনের টাকা দিতে হলো এবং প্রতিজ্ঞা করতে হল উনি এব্যাপারে কোন আইনের ব্যবস্হা নিবেন না। কিছুক্ষন পর সত্যিই সে মিঠুকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল আমার খালার বাড়ির কাছে। আমার বাবা মা মিঠুকে ফিরে পেয়ে বিধাতাকে শুকরিয়া জানালেন। আমার বাবা উনার কথা রেখেছিলেন যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তিতে এ ব্যাপারে কোন রকম আইনের প্রতিকার চাননি।

মিঠুর জীবনটাই এর পর থেকে বদলে গেল। লাজুক মিঠু খেলাধুলায় আর শারিরীক শক্তিতে হয়ে উঠল এক তুখোড় কিশোর বালক। বয়ে চলে দিন, বছর। ওর খেলার সাথী এখন আমাদের বাড়ীর কিশোর ভৃত্য আবু সাঈদ। আবু সাঈদ আমার বয়েসি তবে সব কিছুতেই তার প্রতিযোগিতা মিঠুর সাথে। আম্মার কাছে মার খেয়েছে দুজনে একসাথে সের দরে পত্রিকা বিক্রি করে কট্‌কটি বা বাদামের তক্তি আত্মসাৎ করার জন্য, বাড়ীভরা পেয়ারা বা অন্যসব ফল ভর্তি গাছ থাকা সত্বেও পাশের বাড়ী থেকে পেয়ারা চুরি করার জন্য। আর ও কত কি!

এর ক'বছর পর ব্রহ্মপুত্রের কোল ছেড়ে আমরা চলে এলাম বঙ্গোপসাগরের মোহনায়। আমার বাবার ফটিক ছড়ির শত শত একরের চা বাগানের সৌন্দর্য গাড় পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে বক্ষ্মপুত্রের বালুকাবেলায় বিছানো সূর্যকান্ত সেনের শহরটার স্মৃতির কাছে ম্লান মনে হতো আমার কাছে। মিঠু তখন

নবম শ্রেনীর ছাত্র। ও চুপি চুপি মার্শাল আর্ট শিখলো একজন বার্মিজ ওস্তাদের কাছে। কুংফু, ক্যারাতে ও হয়ে উঠলো আপ্রতিদ্বন্দি। ক'মাসের মাঝে আমিও পাড়ি জমালাম সাত সাগর তের নদীর ওপারে এক লাল মাটির দেশে আমার সবচেয়ে কাছের ১৩ বছরের মিঠু আর ছোটবোন মনিকে রেখে। নূতন দেশে ভাল লাগার কোন জিনিষেই প্রথম মনে পড়ত ওদের দু'জনাকে। প্রতিমাসে বাবা মার কাছ থেকে পাওয়া চিঠিই ছিল জন্মভুমি আর পরিজনের সাথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম তখন।

সেবার অনেকদিন বাবার চিঠি পাইনা - মন খারাপ হয়, লুকিয়ে কান্না মুছি। মনে মনে ভাবি সত্যি যদি পারাতাম উড়ে যেতে মেঘেদের সাথে কৃষ্ণচূড়ায় রাঙ্গানো দেশে বাবা মা ভাই বোনের সান্নিধ্যে। ওদের বাইরে আর কোন পৃথিবীকে তো জানা ছিলনা আমাদের সেসব দিনে। তিন মাস পর বাবার চিঠি এল। মিঠু পীড়ের ওরসে যেয়ে মাথায় আঘাত পেয়েছে। অজ্ঞান অবস্হায় ওকে হস্পিটালে আনা হয়েছে। জ্ঞান ফিরেই ও প্রথম দেখতে চেয়েছে আমায়। এসব জেনে আমার কান্না আর থামেনা। আমার কান্না থামাতে অষ্ট্রেলিয়া থেকে সে বছর কানাডা যাওয়ার পথে চার দিনের জন্য দেশের মাটিকে স্পর্শ করে এলাম আর সঙ্গে করে নিয়ে এলাম মিঠু আর মনির স্নেহ ভরা কোমল মুখের ছবি। প্রথম দেখায় মিঠু আগের মতই আমার লম্বা বিনুনীতে টান দিয়ে বললো , 'কি রে মোমের পুতুল, তুই ত এক বিন্দুও বদলাস্নি! কই ভাবলাম বিদেশে থেকে মেমসাহেব হয়ে আসবি, তা না দেখছি সেই ছিচঁকাদুনে মেয়েটিই রয়েছিস। মাঝখান থেকে মেমসাহেবের মত রঙ্গটা পুড়ে পেত্নির মত হয়েছে'। আর দশ বছরের মিষ্টি মেয়ে মনি লুকিয়ে রইল কোথায় যেন সারাটা ক্ষণ। তারপর আরো পাঁচ বছর কেটে গেল বরফের দেশে। আমার জন্মদিনে মিঠুর কাছ থেকেই শুভকামনা নিয়ে সুন্দর সুন্দর কার্ড আসত সবার প্রথম। এর মাঝে একবার দেশে এলাম, সঙ্গে এল ফারাবী, মিঠু মনির জন্য যেন এক জীবন্ত খেলার পুতুল। ওর কান্না থামানোর সবচেয়ে উত্তম পন্থা ছিল মিঠুর কাঁধে চড়ে ভ্রমন। এর দুই বছর পর দেশে ফিরে এলাম যে বছর, সে বছর মিঠু অর্নাস পাশ করলো - সেভেন্থ পজিশন - মার্শাল আর্টে ব্লাক বেল্ট হোলডার। শহর জুড়ে বন্ধু ভক্তের ছড়াছড়ি। শহরের প্রতিষ্ঠিত ষ্টুডিওতে ওর বড় ছবি বাঁধান। আমাদের ছোট্ট মিঠু এখন শহরের মিঠুন। ওর চেয়ে দশ বছরের বড় ছেলেরাও ভক্তি ভরে ওকে 'বস' বলে ডাকছে - এদের সবাই কলেজ ভার্সিটির ছাত্রছাত্রী থেকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার । আমি বাবার বাড়ী এলে আমাকেও জিন্স আর টি সার্ট পড়ে ওর কাছে আনুশীলন নিতে হত। আমি পারতাম না বলে ছেলেবেলার মত বলে, 'ননীর পুতুল, চৌধুরানী তো! তোকে দিয়ে কিছুই হবে না!' বিকেলে ওর বন্ধুরা আসত, আমি সবার ই 'আপু বা বুবু'। মিঠু সেই আগের মত আমাকে সব সুস্বাদু খাবার খাওয়ানোন জন্য ব্যস্ত থাকতো। আর ওতেই যেন ছিল ওর সব আনন্দ। মজা করে বলত 'তোমাদের পশ্চিমা দেশে আমাদের শহরের মত 'পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট সিঙ্গাড়া কিংবা সবচেয়ে সুস্বাদু ডালপুড়ি পাওয়া যায় না জানি। তোমার কি মনে আছে কৃষ্ণা কেবিনের মালাইকারীর কথা? বা তাজমহল রেষ্টুরেন্টের পরোটা আর ভুনা মাংশ আর পথের ধারে মুজিবরের পেয়াজু ভাজার কথা - চল খাবে চল'। দু'বছরের ছোট্ট ফারাবির খুব পছন্দ মিঠুকে। ওর কান্না বা বায়না থামাতে মিঠু ওকে কাঁধে নিয়ে গাইত 'মামু, চল মোরা দু'জনে বাঘ শিকারে যামু' এটুকু শুনেই ফারাবীর কান্না উধাও, তখন মিঠু ওর জন্য একটা খেলনা বন্ধুক এনে বলত, 'বন্ধুক লইয়্যা রেডি হইলাম আমি আর মামু, চল মোরা বাঘ শিকারে যামু- - - ' ফারাবীর খুশী ত আর ধরেনা- মিঠুর কাঁধে চড়েই সে নিশ্চিন্তে অর্ধেক শহর ঘুরে এল সেই দিন।

সেবার আমরা ঢাকা থেকে চিটাগাং ফিরছি ট্রেনে - ঢাকা মেইলের কুপের বন্ধ জানালার বাইরে আধো ঘুমে আমি শুনলাম মিঠুর কন্ঠ। কর্তাকে বলতেই বিরক্ত হয়ে বললো 'স্বপ্ন দেখছো নিশ্চয়ই - মিঠু আসবে কোথা থেকে এখানে। আমার মন মানেনা - জানালা খুলে আমি দেখলাম দূরে প্ল্যাটফর্মে মিঠু ।

চিৎকার করে ডাকলাম, বললাম কোথা থেকে তুই? বলল, 'গার্ডেন থেকে ময়মনসিংহ ফিরছি। কিছুক্ষন পর দেখলাম ওই উলটোমুখো ট্রেনটায় চেপে ও আমাকে ওই ষ্টেশনে রেখে চলে গেল। আমি চুপ করে শুধু ভাবলাম 'রক্তের বুঝিবা কান ও আছে!'

এর পরের বছর আবার আমি অষ্ট্রেলিয়ার পথে - এবার একাকি। এয়ারপোর্টে চার বছরের ফারাবীর মাম্মির বিচ্ছেদ বেদনা থামাতে মিঠুর মহাঔষধ খুব দ্রুত কাজ দিল। যে মাত্রই মিঠু বলল 'চল মামু, মোরা বাঘ শিকারে যামু' মুহুর্তেই ওর কান্না বন্ধ - মায়ের আসন্ন বিচ্ছেদ ব্যথার চেয়ে বাঘ শিকারের এডভেঞ্চার তাকে চাঙ্গা করে তুলল।

এর পরের বছর মিঠু বিয়ে করল। ওদের ঘর জুড়ে এলো আলোমনি। মিঠু ওকে এঞ্জেলা বলেই ডাকত কেননা আমিই ওর জন্য নামটা পছন্দ করেছিলাম যা মিঠুর নামেরই মেয়ে রূপ। এর মাঝে আমাদের চা বাগান গুলো পানির দামে বিক্রি হয়ে গেল। আব্বার অসুস্হতার পর দাদা আর মিঠু পারেনি ওগুলোর সুষ্ঠু পরিচালনা করতে। আব্বা দেহত্যাগ করলেন অনেক রোগে শোকে। দাদা চলে গেল ইংল্যান্ডে। মিঠুদের ছেলে ঈসা এল। মিঠু ওর সংসার নিয়ে রয়ে গেল ময়মনসিংহের বাড়িতে যেখানের প্রতি ধুলিকনায় লেখা আছে আমাদের শিশু-কিশোর বেলার গল্পকথা। মা কান্নাকাটি করতেন - ময়মনসিংহের পাট চুকিয়ে মিঠুকে ওর সংসার নিয়ে ঢাকায় মার কাছে চলে আসতে বলতেন। মিঠু আসি আসি করেও আসত না। প্রতিবার দেশে গেলে আমি যেতাম ওদেরকে দেখতে। আমাদের আসার খবর পেয়েই ও রান্না বান্নার ধুম বসিয়ে দিত প্রতিবার। নিজেই কিছু না কিছু রান্না করত আমার জন্য। গেইটের কাছে দাড়িয়ে থাকত সেই ব্লু জিন্স আর টিসার্ট পরে আমাকে আভ্যর্থনা জানাতে। ২০০৬ সালের জানুয়ারিতে বললাম, 'আয়না দেখে যা তোর 'মল্লিকাদি'র দেশটা। ছেলেমেয়েরা ত বড় হলে নিজেদের যোগ্যতায় যেতেই পারবে, আমি তোর আর মুন্নির জন্য টিকিট পাঠাবো, আমার কাছে বেড়িয়ে আসবি এবার।' হেসে বলেছিল ও 'সত্যি যাব তোমাদের লাল মাটির দেশটায়'। পরদিন আমরা ফিরব সিড্নীতে - মন খারাপ। মিঠু কথা দিয়েছিল আমাকে সি অফ করতে আসবে ঢাকায়, এলোনা। সেদিন ছেলেমেয়েরা আমার জন্য আনলো অনেক ফুল - নিয়ে গেল চাইনিজ খেতে আমার জন্মদিন পালন করতে। সাথে মনির ফ্যামিলি। আমি বার বার মিঠুকে আর ওর ছেলেমেয়েকে স্মরণ করছিলাম - ওরা থাকলে কত ভাল লাগত বলছিলাম । বাড়ি ফিরে দেখি মিঠু। আমি খুশিতে জড়িয়ে ধরলাম। বলল 'তোমাকে তো বলেছি আমি আসবো - তোমায় বিদায় জানাতে'। পরদিন খুব ভোরে আমার দরজায় মৃদু করাঘাতে ঘুম ভাঙ্গল । সেই বাল্যকালের মত উঠে দেখি মিঠু। বলল 'আলোটার পরীক্ষা, যেতে হবে, দোয়া করো। মেয়েটা ঠিক যেন হয়েছে তোমার মত - সারাদিন বইয়ে মুখ গুজে আছে। আমি না থাকলে ওকে তুমি দেখো'। আমি ওর হাত ধরলাম, বললাম 'কি যে বলিস আজ কাল তুই! তুই আবার কোথায় যাচ্ছিস?' ও কথা ঘুরিয়ে বললো 'আমার ইচ্ছে একটা পাহাড় কিনি কাছে কোথাও - ওখানে অনেক শাল পিয়ালের গাছ লাগাবো - আর তো চা বাগান কিনতে পারবো না, একটা শুধু পাহাড় কিনবো তবে তার আগে এবছরের শেষে আম্মার কাছে চলে আসব ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা হয়ে গেলেই'। বললাম, তুই ত আজ ও 'বলাই' - গাছের শখ তোর রয়েই গেছে। মিঠু ছোটবেলা থেকেই গাছ পচছন্দ করত - কোথা থেকে নিয়ে আসত কত সব দুঃষ্প্রাপ্য গাছ আর তার পরিচর্যায় অনেক সময় দিত। আমি ওর সঙ্গে সঙ্গে গেইট পর্যন্ত এলাম। ও আমায় বিদায় জানাতে এসেছিল, অথচ মনে হল আমিই যেন ওকে বিদায় জানাচ্ছি। আমি দাড়িয়ে রইলাম আমাদের ঢাকার বাসার গেইটে যতক্ষন না শীতের সকালের কুয়াশার মাঝে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল মিঠু'র কায়া।

জুন মাসে দেশে ফোন করে জানলাম মিঠু হঠাৎ করেই ক'দিন আগে ওর সংসার গুটিয়ে ঢাকায় চলে এসেছে। ওর আগমনে মা যেন হাতে চাঁদ পেয়েছেন। মার বাড়ির পাঁচ তলায় ক'দিনেই সুন্দর সংসার গুটিয়ে বসল। ছেলেমেয়ে নূতন স্কুলে ভর্তি হয়েও গেল। কথা হল কিছুক্ষন আমার সঙ্গেও। বলল, এবার মার কাছাকাছিই থাকব ভেবেছি - ক'দিনেরই বা এ জীবন- সবাই কাছাকাছি থাকাই ভাল। একটু পরে মনি আসবে, আমরা সবাই মার সাথে চা খাচ্ছি - তুমি থাকলে কি ভীষন মজা হতো'! বললাম আমি, 'ভেবেছিলাম এবার আর আসবো না, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এ মূহুর্তেই উড়ে চলে আসি তোদের কাছে। আমি এবার নভেম্বরের শেষেই চলে আসব - অনেক দিন পর একই বাড়িতে সবাই থাকবো আমরা মায়ের কাছে'। আমি ওকে শুভাষিশ জানিয়ে বিদায় নিলাম তখনকার মত। ফোন রেখেই ঢাকা যাওয়ার টিকিট বুক করলাম। এর ক'দিন পর ফোনে আম্মার কন্ঠ শুনেই বুঝলাম কিছু একটা হয়েছে। আম্মা বললেন 'মিঠুরা ত চলে গেছে অথচ যাওয়ার আগের দিন ও বলেছিল 'মা আমি কিন্তু থাকতেই এসেছি, এবার ময়মনসিংহের বাড়িঘরের একটা ব্যবস্হা করেই শান্তিতে তোমার কাছে কাটিয়ে দিব দিনগুলো - তুমি আর দুঃশ্চিন্তা করোনা।' মাকে সান্ত্বনা দিলাম, বললাম , 'ও তো একটু পাগলাটেই, নিশ্চয়ই বছর শেষে চলে আসবে হঠাৎ করেই আবার'। আমার মনে আছে সে দিনটা ছিল বুধবার, ৫ই জুলাই ২০০৬। কি যেন কেন আমার মনটাও ভারি হয়ে রইল। ৮ই জুলাই আমারা গেলাম এক বন্ধুর নিমন্ত্রনে। অনেক আনন্দ গানেও আমার কেন যেন ভাল লাগছিল না - দূর থেকে শ্যারন আর সোনিয়াকে দেখছিলাম আর কেমন যেন কষ্ট হচ্ছিল ওদের জন্য কেননা ওরা গতবছর ওদের তরুন উজ্জ্বল একমাত্র ছোটভাই ফাহিমকে হারিয়েছে অতর্কিতে। ফাহিম হলিডে'তে ব্যংকক গিয়েছিলো, সমুদ্র গ্রাস করেছে নিয়েছে ওই অরুন তরুন প্রাণটা। আমি কি সেই মূহুর্তে ভুল করেও ভাবতে পেরেছিলাম আমিও চিরদিনের জন্য শ্যারন সোনিয়ার মত সবচেয়ে স্নেহের জন হারানোর ব্যথা বয়ে বেড়াবো।

রাতটা কেমন যেন আধো ঘুম আধো জাগরনে কেটে গেল। ভোর রাতের দিকে শুনলাম নীচের তলায় আনসারিং মেশিনে ম্যাসেজ রাখা হচ্ছে। ভাবলাম কানাডা থেকে ডাক্তার আপা ফোন করেন ওসময়টায়। উঠবো উঠবো করছি যখন, সত্যি ডাক্তার আপাই ফোন করলেন, কিছুক্ষন কথাও বললেন। উনার সাথে কথা বলে আমি নীচে নেমে এলাম। সুন্দর শীতের সকাল নরম আলোয় ভরা। চায়ের ক্যাটেল অন করে দিয়েই আনসারিং মেশিন অন করলাম। প্রথম ম্যাসেজটার কন্ঠ চিনলাম না, শুধু আমার নাম সম্বোধন করেই কেটে দিয়েছে। দ্বিতীয় ম্যাসেজটা মনির বরের কন্ঠ। পৃথিবীর করুনতম, কঠিনতম সংবাদ আমার জন্য। আমি আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। ছেলে ঘুমাচ্ছিল, আমার আর্তনাদে ছুটে এলো। আমায় বুকে করে নিয়ে ওর বেডে শুইয়ে দিল। আমি তখন ও উম্মাদের মত বলছি 'আমি মিথ্যা শুনেছি, ওরা মিথ্যে কথা বলছে, আমি বিশ্বাস করিনা, এ হতেই পারে না!' ফারাবি শুনলো ম্যাসেজটা। আমায় বুকে জড়িয়ে রাখলো কিছু না বলেই। আমি ওর বাঁধনে আবারও লুটিয়ে পড়লাম। আমি কোনভাবেই মেনে নিতে পারলাম না মিঠু কাল রাতে আমাদের সবাইকে ছেড়ে চিরদিনের মত ঘুমিয়ে গিয়েছে।

সারাদিন এরপর আমার কাজিন ভাইয়েরা এল, বন্ধু সজ্জনেরা এলো, অনেক সহনুভুতি সান্ত্বনায় ভরল। আমি যেন কেমন শূন্য ভাবলেশ হয়ে জেগে রইলাম। আমি ভাবতে পারছিলাম না কিছুই। শুধু মনে হচ্ছিল ও তো আমার পরে এসেছিল এই পৃথিবীতে, ওর তো আমার চেয়ে বেশী সময়ের অধিকার ছিল এই পৃথিবীর কাছে। মিঠু আমার ছোটভাই, আমাদের মাসুম, চলে গেল আবারও আমাকে না বলে বৃহত্তর জীবন চক্রে এই পৃথিবীর কক্ষপথ ছেড়ে আর এক কক্ষপথে ৮ই জুলাই ২০০৬। আমার সাহস

হলোনা একবার মার সঙ্গে কথা বলার। কি বলবো! কি বলে সান্ত্বনা দিব প্রাণ প্রিয় সন্তান হারা বেদনা বিধুর এক মাকে।

পরদিন কি এক শূন্যতায় ভেসে অফিসে গেলাম। অন্যদিনের মত দরজা খুলেই প্রথম যা আমার চোখে পড়ে তা মিঠু'ই দেওয়া 'অস্তিত্ব' ছবিটা। ওর'ই নাম দেওয়া, ওরই হাতের লেখা 'অস্তিত্ব'। আমাদের দু'বোনের মাঝে স্বাস্হ্য উজ্জ্বল মিঠু আর সামনে আমাদের বাবা মা, মার কোলে ছোট্ট ফারাবী। মিঠুর এক বন্ধুর তোলা ছবিটা আমাদের ময়মনসিংহের বাসায়। সহকর্মি, ভিজিটরদের অনেকেই দেখেছে ছবিটা, জেনেছে আমার রক্তের অস্তিত্বের কথা। আজও মিঠু বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে আমার পানে - শুধু আশ্চর্য হয়ে আমি লক্ষ্য করলাম কোন যাদুবলে 'অস্তিত্ব' নামটা মুছে গেছে ছবিটার ডান পাশের কোনা থেকে যা মিঠু লিখেছিল নিজ হাতে যখন আমাকে ছবিটা ও লেমিনেট করে দিয়েছিল। এই প্রথম আমি ডুকরে কেঁদে উঠলাম স্হান কাল ভেদে। পাশের রুমের কলিগ Ian এলো একটু পর, কোমল কণ্ঠে বলল, 'go home mamta, do you want me to drive you home?' . আমার ছেলে আর মেয়ে বুকে জড়িয়ে রাখল আরও দুই দিন। আমার শরীর মন ভেঙ্গে পড়ল। ডাক্তার বললেন, 'go home and share your grief with your family - - '.

আমি যখন আমাদের বড় হয়ে উঠার আঙ্গিনায় গেইটে পৌচ্ছালাম, আজ আর আমার আগমন প্রতিক্ষায় মিঠু ছিলনা - মনে হল ও যেন ঐ ছোটবেলার মত ভিতরের ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে আছে। আমি কাঁপা পায়ে গেলাম মার কাছে, আমি ভাষাহীন আর্তনাদে জড়িয়ে ধরলাম মুন্নি, আলো আর ঈসাকে - আমি ওদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার কোন ভাষা খুজে পেলাম না। শুধু পরদিন আমি তিনটা বকুলফুলের চাড়াগাছ কিনলাম নিজে নার্সারিতে গিয়ে । তারপর তিন ঘন্টা drive করে গেলাম আমার পূর্বপুরুষদের ভিটায় যেখানে আমার বাবার পাশেই পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে মিঠু। আমি আলো ঈসাকে নিয়ে মিঠুর শিয়রে লাগিয়ে দিলাম বকুল ফুলের গাছ। মনে পড়ে মিঠু, নূতন নূতন গাছ লাগানোতে ছিল তোর আনন্দ সেই বাল্যকাল থেকেই আর আমি তাই তোকে আদর করে 'আমাদের বলাই' বলে ডাকতাম। আমাদের বাসার বিরাট বাগানে তুই যেদিন দারুচিনি গাছ লাগালি, তোর উচ্ছ্বাস যেন আর ধরেনা তা নিয়ে! মনে পড়ে শীতের সকালে শিউলীফুলের মালা গাঁথার প্রতিযোগিতা তোর আমার সাথে - কার টা বেশি বড় এই নিয়ে তুই ই বাজী ধরতি। আবার অল্পক্ষন পর আমার ধীর স্থিরতার কাছে তুই উৎসাহ হারাতি - হাসিমুখে বলতি 'ওসব মেয়েদেই সাজে'! অথচ আজ কিছু না বলে আমায় হার মানিয়ে তুই দ্রুত পার হয়ে গেলি এই জীবনের গন্ডি। তুই হারিয়ে গেলি কোন লক্ষ তারার দেশে। আবার তোকে আমি 'নাড়ু' বলেও ডাকতাম, কেননা তুই প্রায় রোজই পথ থেকে অনাহারি শিশুদের নিয়ে আসতি। ওদের পেটপুরে খাবার খাইয়েই যেন তুই খুশি হতি সবচেয়ে বেশি এই পৃথিবীতে। আম্মা কখনো বিরক্ত হলে, তুই বলতি, 'আমার খাবারটা দিয়ে দাও ওদেরকে।' মুন্নি বলে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ও তুই ওমনিই ছিলি। তাইত শহরের কত লোক এলো তোকে শেষ বিদায় জানাতে। লোকে বলে 'কখন কেউ খালিহাতে ফিরেনি ওঁর কাছ থেকে সাহায্য চেতে এসে - -'।

মিঠু আমি তো কথা রেখেছি, আমি নভেম্বরে আবার দেশে গেছি। আম্মা চা করেছেন, মনি এসেছে , মুন্নি এসেছে, তোর আলো আর ঈসা এসেছে। সবাবই চোখ জলছল্ছল। মা থেকে থেকে কেঁদে উঠেন। মা বলে 'কি সুন্দর হয়েছিল ছেলেটা আমার। হদুল সার্টটায় আরো উজ্জ্বল দেখাত ওকে'। ছোট বেলার মত দুষ্টুমি করে বলতে ইচ্ছে হয় 'মার হলদে পেঁচা, তুই'। আজ আমরা কেউ কথা বলি না। নিজের কান্না বুকে চেপে মার কান্না থামানোর চেষ্টা করি। আমরা সবাই নীবরে চা শেষ করি। তুই-ই শুধু

হাসিস্ দেওয়ালে ছবি হয়ে । তোর ছেলে ঈসা সব ভুলে কোলাহল করে ছ'বছরের শিশুর উচ্ছ্বাসে - ওর চায়ের কাপ নিয়ে লাজুক চোখে মিষ্টি হেসে কোল ঘেষে দাড়ায়। এক সকালে হঠাৎ এসে আমার দিকে না তাকিয়ে, 'বাব্বা তোমাকেও অনেক ভালবাসত - -' বলেই ও দৌড়ে চলে গেল। আমি আর ওকে ডাকলাম না পিছু - ওর ঔ ছোট্ট বুকের ভেতরে বাব্বাকে হারানোর কষ্ট ওকেই সামলাতে দিলাম। প্রতি সকালে ঘুম ভাঙ্গলে প্রথমেই তোর মত ও নেমে আসে পাঁচ তলা থেকে তিন তলায়। আমার ভেজানো দরজার বাইরে দাড়িয়ে মাকে বলে, 'দিদা বড়ফুপ্পি কি উঠেছে?' আমি দৌড়ে এসে ওকে বুকে জড়িয়ে নিই। ও লজ্জা পায়, বলে, আবার যখন আসবে অনেক বছর থাকবে আমাদের কাছে তখন - - ।' আমি মনে মনে বলি আমি তো হাজার বছরধরে একই রক্তধারায় বইব তোর সাথে॥

মিঠু, গতমাসে আমি যখন Delphi তে Temple of Appolo র যে বেদিকায় Socretice এবং Plato এসে বসতেন অন্যান্য Oracles দের সাথে, সেখানে কিছুটা সময় একা বসে ছিলাম। তুই তো জানতি ছেলেবেলা থেকেই আমার আকর্ষন ছিল গ্রীক সভ্যতার উপর। মনে পড়ে তোর, আম্মা যখন আমাদের গল্প বলতের গ্রীক মিথোলোজির, তুই প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়তি। তারপর একটু বড় হয়ে আমি যখন 'Wise Men of the Old' প্রবন্ধে পড়তাম গ্রীক Philosopher দের জীবনি তুই বেশ মনোযোগ দিয়েই শুনতে চাইতি আমার কাছে ঐ সভ্যতার ইতিহাস। ঐ বেদিতে বসে আমার মনে হচ্ছিল আকাশের গায়ের মেঘের পর্দার আড়ালেই ছোটবেলার মত লুকোচুরি খেলতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিস্ তুই ওখানে । আর আমি একা হয়ে গেছি। আমি আবার আগের মত পড়তে চাই সারা রাত জেগে, পড়াতে মন বসে না। আমি লিখতে চাই শ্রাবনের বরষনের মত অঝোর ধারায়, আমি লিখতে পারিনা। আমি এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশে উড়ে চলি অথচ মনটা পড়ে থাকে জন্মভূমিতে আমার দুঃখিনি মায়ের কোলে। কত ছবি, কত গান, কত কথা, হাসি, কান্না, সুখ, দুঃখেরা সারি বেধে ভেসে চলে আমার মনের আকাশে - আর সাথে চলিস্, মিঠু, তুই, নীরবে। আমি বলি 'আমায় আর একবার ডাক, মিঠু, আমি এবার সত্যি তোর সাথে খেলতে যাব।' তুই শুধু মিষ্টি হাসিস্ - নীরবে॥

৬ই জুলাই, ২০০৭
Palmerston North, New Zealand

আমার এই লেখা আলো আর ঈসার জন্য। আমার স্মৃতিচারণে ওরা যদি খুজে পায় ওদের বাব্বাকে, আমিও আসবো ওর সাথে একই রক্তের রাঁখীতে জড়িয়ে॥